বিধবা-বিবাহ

শ্রীভাগবত চন্দ্র দাশ বি, এল।

মূল্য দুই আনা মাত্র
অথবা
দশজনকে পড়িয়া শুনাইবার প্রতিশ্রুতি।

বিধবা-বিবাহ

শ্রীভাগবত চন্দ্র দাশ বি, এল।

মূল্য দুই আনা মাত্র

অথবা

দশজনকে পড়িয়া শুনাইবার প্রতিশ্রুতি।

মেদিনীপুর বিধবা-বিবাহ
সমিতির পক্ষ হইতে
শ্রীরাসবিহারী ভঞ্জ
কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

প্রথম সংস্করণ—১০০০
১৩ই জ্যৈষ্ঠ—১৩৩১

দ্বিতীয় সংস্করণ—১০০০
৫ই পৌষ—১৩৩৩

লাহোর বিধবা-বিবাহ-সহায়ক সভার
আনুকূল্যে
মেদিনীপুর
বিজয়া প্রেস হইতে
শ্রীবঙ্কিমবিহারী দাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত

ভূমিকা।

বঙ্গমাতার মুখোজ্জ্বলকারী সন্তান প্রাতঃস্মরণীয় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের স্বর্গগমনের পর বাংলায় কেহই ভাবিতে পারেন নাই যে দেশে আবার বিধবাবিবাহের আন্দোলন প্রচলিত হইবে, কর্ম্মবীর ঈশ্বরচন্দ্র ঐকান্তিক চেষ্টাতেও যাহা সাধন করিতে পারেন নাই, অন্য কেহ তাহাকে ফলপ্রসূ করিতে পারিবে। কিন্তু মঙ্গলময় পরমেশ্বরের বিধান অপূর্ব্ব। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পরলোক গমনের বহুবর্ষ পরে—যখন দেশ তাহার আন্দোলনের কথা বিস্মৃত-প্রায়, তখনই দেশে বিধবা-বিবাহ আন্দোলন আবার প্রবল হইয়া উঠিল। এবারে আর বিচারবিতর্কে অনর্থক সময় নষ্ট হইল না, আন্দোলনের সূচনাতেই উপর্য্যুপরি কয়েকটী বিধবা-বিবাহ সংঘটিত হইয়া নব প্রবর্ত্তিত আন্দোলনটীকে অপূর্ব্ব সফলতায় মণ্ডিত করিয়া দিল।

পূজনীয় বিদ্যাসাগর মহাশয় বিধবাগণের করুণ ক্রন্দনে ব্যথিত-হৃদয় হইয়া তাহাদের অশ্রুবারি মুছিবার জন্য দেশে বিধবাবিবাহ পুনঃ প্রচলনের চেষ্টা করিয়াছিলেন। দীর্ঘকাল অপ্রচলন হেতু বিধবা-বিবাহ তখন সমাজে নিন্দিত। বিবাহিতা নারীরা কোনদিনই ধারণায় আনিতে পারেন নাই যে আবার তাঁহাদের বিবাহ সম্ভব। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের

প্রস্তাব উত্থাপিত হওয়া মাত্রই দেশে দারুণ বিক্ষোভ উপস্থিত হইল। শাস্ত্রিগণ, সমাজপতিগণ, তার্কিকগণ, সংস্কারান্ধগণ, নৈষ্ঠিকগণ, নানাপ্রকারে বিদ্যাসাগর মহাশয়কে অপদস্থ ও নিরস্ত করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। অসামান্য প্রতিভা ও অলৌকিক পাণ্ডিত্যবলে বিদ্যাসাগর মহাশয় বিধবা-বিবাহের শাস্ত্রীয়তা প্রতিপাদন করিয়া বিরুদ্ধবাদিগণের মুখ বন্ধ করিলেন। দেশকে বিধবা বিবাহের উপযোগী করিয়া গঠন করিবার চেষ্টাতেই তাঁহার সমগ্র জীবন ব্যয়িত হইল। তাঁহার চেষ্টার শুভ পরিণাম তিনি দেখিয়া যাইতে পারেন নাই। তিনি কেবল বঙ্গীয় হিন্দুগণের হৃদয়ক্ষেত্র কর্ষণ করিয়া তাহাতে বিধবাবিবাহ-রূপ বীজ বপন করিতে পারিয়াছিলেন।

কিন্তু কৃষিক্ষেত্রে বীজবপনের সঙ্গে সঙ্গেই ফলপ্রাপ্তি হয় না। মৃত্তিকার অভ্যন্তরে লুক্কায়িত থাকিয়া উপ্ত বীজ ক্রমশঃ অঙ্কুরাকারে পরিণত হইয়া লোক-লোচনের সম্মুখে আবির্ভূত হয়; পরে তাহাই আবার পত্রপুষ্পমণ্ডিত হইয়া ফলবান হয়। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মৃত্যুর পর বিধবাবিবাহ আন্দোলন থামিয়া গিয়াছিল বটে, কিন্তু তাহা মৃত হইয়া যায় নাই। ধরণী-বক্ষে উপ্ত বীজের ন্যায়, তাহাই দেশের, সমাজের কোটি কোটি নরনারীর হৃদয়মধ্যে অলক্ষিত ভাবে বাস করিয়া প্রস্ফুটিত হইবার জন্য শক্তি সঞ্চয় করিতেছিল। তাই আমরা দেখিতে

পাই গত ১৩২৯ সালের চৈত্র মাসে সামান্য কথোপকথনের ফলে দেশের মধ্যে বিধবাবিবাহের প্রচারকল্পনা পুনঃ জাগ্রত হইয়া সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র মেদিনীপুর জেলার মধ্যে অতি দ্রুত গতিতে প্রসারিত হইয়া গেল। বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহার জীবদ্দশায় কয়টী বিধবার বিবাহ দিতে পারিয়াছিলেন জানিনা, কিন্তু মেদিনীপুরের বিধবা-বিবাহ-সমিতি এক বর্ষের চেষ্টাতেই জেলার মধ্যে দ্বাদশটী* বিধবার বিবাহ প্রদান করিতে সমর্থ হইয়াছেন।

বর্ত্তমানকালে পল্লীবাসীরাই বিধবা বিবাহ প্রচলনে একান্ত উৎসাহ প্রদান করিতেছেন। কেন না ব্যভিচার ও ভ্রূণহত্যার পাপ সহরে গোপন করা যাইতে পারে, পল্লীতে তাহা গোপন করিবার উপায় নাই। নিত্য এই দ্বিবিধ পাপের কাহিনী কর্ণপটাহে বিষম জ্বালা উৎপাদন করিতেছে তাই তাঁহারা তাহাদের পাপনিবৃত্তির জন্য বিধবাবিবাহে সমুৎসুক হইয়াছেন।

বিধবাবিবাহ অপ্রচলনের জন্য আমাদের হিন্দু জাতি মরণের পথে ক্রমশঃ অগ্রসর হইতেছে। সন্তান, প্রজননক্ষমা বহু রমণীকে আমরা বিবাহিত জীবন হইতে বঞ্চিত করিয়া,

* অদ্য পর্য্যন্ত মেদিনীপুর বিধবাবিবাহ সমিতির চেষ্টায় ৫২টী বালবিধবার বিবাহকার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে। ১৯২৩ সালের এপ্রিল মাসে এই সমিতি স্থাপিত হইয়াছিল।

দেশের লোক সংখ্যার হ্রাস করিয়া, জাতির জীবনীশক্তি নষ্ট করিয়া দিতেছি এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে দেশের মধ্যে ব্যভিচার ও অন্যান্য গুপ্ত পাপের তাণ্ডব লীলায় সহায়তা প্রদান করিয়া, দেশের জীবনীশক্তিকে জরাজীর্ণ ও ব্যাধিগ্রস্ত করিয়া তুলিতেছি।

(সেন্সাস রিপোর্টে দেখিতে পাওয়া যায় যে সমগ্র বঙ্গে বেশ্যার সংখ্যা ৪৩৩৩০ ; তন্মধ্যে হিন্দু বেশ্যার সংখ্যা ৩১২৯৪। এই বেশ্যাগণ যে প্রধানতঃ নির্য্যাতিত হিন্দু বিধবা তাহাতে কাহারও সন্দেহ নাই। এই একটী মাত্র কারণেই দেশে বিধবাবিবাহের প্রচলন হওয়া উচিত। অন্য কারণের নাই উল্লেখ করিলাম।)

পূজনীয় বিদ্যাসাগর মহাশয় পঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচার করিয়া বিধবাবিবাহ যে অশাস্ত্রীয় নহে, তাহা প্রমাণিত করিয়াছেন। শ্রীযুত ভাগবত চন্দ্র দাশ মহাশয় এই ক্ষুদ্র পুস্তিকায় হিন্দুর সভ্যতা ও সমাজবন্ধনের প্রামাণিক ইতিহাস প্রদান করিয়া বিবাহ ও প্রধানতঃ বিধবাবিবাহ সম্বন্ধে প্রচলিত নানা কুসংস্কারের নিরসন করিয়াছেন। আমরা আশা করি তাঁহার এই ক্ষুদ্র পুস্তিকাখানি দেশের অশেষ কল্যাণের পন্থা উন্মুক্ত করিয়া দিবে। ইতি ১১ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৩১।

কর্ণেলগোলা, }

বিধবা বিবাহ

হিন্দুবিধবার পুনরায় বিবাহ করা কর্ত্তব্য কি না, স্থির করিতে হইলে শাস্ত্রের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। কর্ত্তব্যা-কর্ত্তব্যনির্দ্ধারণে শাস্ত্রই একমাত্র সহায়। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গীতায় ১৬ অধ্যায়ের ২৪ শ্লোকে বলিয়াছেন, "তস্মাৎ শাস্ত্রং প্রমাণং তে কার্য্যাকার্য্য ব্যবস্থিতৌ" অর্থাৎ কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য-নির্দ্ধারণে শাস্ত্রই প্রমাণ। কিন্তু অন্ধ বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া অনুস্বারবিসর্গযুক্ত বাক্যমাত্রকে শাস্ত্র বলিয়া মান্য করিলে চলিবে না। যাহা প্রকৃত শাস্ত্র তাহা যুক্তির বিরোধী নহে। মনুষ্যের বিবেকের বিরুদ্ধে শাস্ত্রের বিধান নাই। অনেকে স্বার্থ অথবা কুসংস্কারের বশীভুত হইয়া সমাজে স্বীয় অভিমত প্রচলন জন্য সংস্কৃত ভাষায় গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, কেহবা প্রাচীন ঋষির রচিত গ্রন্থে স্বীয় শ্লোক প্রক্ষিপ্ত করিয়াছেন। তাঁহাদের বাক্য শাস্ত্র মধ্যে পরিগণিত না হয়, এইজন্য মহর্ষি বৃহস্পতি শাস্ত্র বিচারের বিধান করিয়া বলিয়াছেন :—

কেবলং শাস্ত্র মাশ্রিত্য নকর্ত্তব্যো বিনির্ণয়ঃ।
যুক্তিহীনবিচারেণ ধর্ম্মহানিঃ প্রজায়তে

অর্থাৎ কেবল শাস্ত্রবাক্যকে আশ্রয় করিয়া কর্ত্তব্য নির্ণয় করা উচিত নহে; শাস্ত্রবাক্য যুক্তিবলে বিচার করিয়া কর্ত্তব্য অবধারণ করিবে, নচেৎ ধর্ম্মহানি অবশ্যম্ভাবী। যুক্তির সারবত্তা অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করে এবং অভিজ্ঞতা অতীত বিষয়ের জ্ঞান দ্বারা পরিপুষ্ট হয়। সুতরাং বিধবা-বিবাহ হিন্দুগণের কর্ত্তব্য কিনা তাহা নির্ণয় করিতে হইলে, হিন্দুসমাজের অতীত অবস্থার আলোচনা একান্ত আবশ্যক হইয়া উঠে। সেজন্য আমরা সংক্ষেপে তদ্বিষয়ে আলোচনা করিতেছি।

অতি প্রাচীনকালে অর্থাৎ সত্যযুগে, নরগণের মধ্যে বর্ণাশ্রমের ব্যবস্থা ছিল না। কেহ উচ্চ বা কেহ নীচ ছিল না, কেহ ভদ্র বা কেহ অভদ্র ছিল না, কেহ ধার্ম্মিক বা কেহ অধার্ম্মিক ছিল না। লিঙ্গ পুরাণ ৩৯ অধ্যায়ে, মার্কণ্ডেয় পুরাণ ৪৯ অধ্যায়ে এবং ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ ৮ম অধ্যায়ে, আর্য্যগণের পুরাবৃত্ত সহজবোধ্য ভাষায় সুস্পষ্টভাবে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে।

বর্ণাশ্রম ব্যবস্থা চ তদাসীন্ন ন সঙ্করঃ। লিঙ্গপুরাণ।

পর্ব্বতোদধিবাসিন্যঃ হ্যনিকেতাস্ত সর্ব্বশঃ।

মার্কণ্ডেয় পুরাণ।

তুল্য রূপায়ুষঃ সর্ব্বা অধমোত্তমবর্জ্জিতাঃ॥

লাভালাভৌ নতো স্বাস্তাং মিত্রামিত্রে প্রিয়াপ্রিয়ে॥

অর্থাৎ তখন ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্র বর্ণবিভাগ বা বৈদ্য-কায়স্থ-সদ্‌গোপ-মাহিষ্য প্রভৃতি জাতিভেদ অথবা ব্রহ্মচর্য্য গার্হস্থ্যাদি আশ্রম ব্যবস্থা ছিল না। তখন নরগণ অরণ্যে পর্ব্বতকন্দরে বা সমুদ্রতীরে বাস করিত। সকলের আকৃতি ও পরমায়ু সমান ছিল। ইতর-ভদ্রাদি বিশেষণপদ তখনও সৃষ্ট হয় নাই। কাহারও নিজস্ব কোন সম্পত্তি ছিল না, সুতরাং কেহ কাহারও প্রিয় বা অপ্রিয় ছিল না বা কেহ কাহারও মিত্র বা শত্রু ছিল না। উহাই নরগণের আদি বা অকৃত্রিম অবস্থা। তখন নরগণ প্রকৃতির প্রকৃত সন্তানরূপে প্রকৃতির উপর নির্ভর করিয়াই দিন যাপন করিত। সেই অনাবিল পবিত্র অবস্থা পৃথিবীতে চিরস্থায়ী হয় নাই। নরগণ প্রকৃতির উপর নির্ভর না করিয়া বুদ্ধিবলে ক্রমে সুখের কল্পনা করিতে লাগিল এবং সেই কল্পিত সুখমরীচিকার পশ্চাতে ছুটিতে ছুটিতে প্রকৃতির বিরুদ্ধাচরণে প্রবৃত্ত হইল অর্থাৎ তাহারা সভ্য হইতে চেষ্টা করিল।

যখন নরগণ কথঞ্চিৎ সভ্য হইল তখন তাহারা কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যের দ্বারা অর্থ সঞ্চয় করিল, ভাষার উন্নতি করিল, যজ্ঞ দ্বারা অগ্নির উপাসনা করিল, কিন্তু সভ্যতার অনুচর হিংসা ক্রোধ রাগ দ্বেষ তাহাদের মধ্যে দেখা দিল। নরগণের মধ্যে যাঁহারা সমধিক বিদ্বান্ হইলেন তাঁহারা দেব

উপাধি লাভ করিলেন। দৈত্য, দানব, নাগ ও মানবগণ এই দেবগণের জ্ঞাতি। (দৈত্যদানবগণ সাধারণতঃ অসুর নামে খ্যাত)। হিমালয়ের পরপারে ইলাবৃত বর্ষে তাঁহাদের সকলের বাস ছিল। তাঁহাদের রমণীয় বাসস্থানের নাম ছিল স্বর্গ। কিছু কাল পরে স্বর্গে দেব-উপাধিধারী নরগণের সঙ্গে তাঁহাদের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা অসুরগণের বিবাদ উপস্থিত হইল। অসুরগণ দেবগণের যজ্ঞ ভঙ্গ করিতে সচেষ্ট হইলেন, মানবগণ দেবগণের পক্ষ অবলম্বন করিলেন। তখন ব্রহ্মা (অর্থাৎ যজ্ঞের অধ্যক্ষ মহাশয়) যজ্ঞ-রক্ষার জন্য চাতুর্ব্বর্ণ্যের সৃষ্টি করিলেন। যাঁহারা যজ্ঞকর্ম্মে নিযুক্ত হইলেন তাঁহাদের উপাধি হইল ব্রাহ্মণ, যাঁহারা অসুর-গণের হস্ত হইতে যজ্ঞ রক্ষা করিতে নিযুক্ত হইলেন তাঁহাদের বিশেষণ হইল ক্ষত্রিয়, যাঁহারা যজ্ঞীয় দ্রব্যসম্ভার উৎপাদন করিতে নিযুক্ত হইলেন তাঁহাদের আখ্যা হইল বৈশ্য এবং যাঁহারা এই ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যগণের কার্য্যসৌষ্ঠবের জন্য আদেশ পালনে নিযুক্ত হইলেন তাঁহাদের নাম হইল শূদ্র। ভ্রাতৃগণ স্ব স্ব যোগ্যতা অনুসারে প্রয়োজনীয় চারি কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়া, একই যজ্ঞ সম্পাদনে ব্রতী হইলেন এবং সহজে অসুর-গণকে পরাজিত করিলেন। ব্রহ্মা গুণকর্ম্মের বিচার করিয়া যজ্ঞনিষ্পত্তির নিমিত্ত এই যে ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, তাহা

তৎকালে সময়োপযোগী হইয়া ছিল। বিষ্ণুপুরাণ প্রথমাংশ ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে বলিলেন :—

যজ্ঞ নিষ্পত্তয়ে সর্ব্ব মেতদ্ ব্রহ্মা চকারবৈ
চাতুর্ব্বর্ণ্যং মহাভাগ যজ্ঞ সাধন মুত্তমম্ ॥

ত্রেতা যুগে এই বর্ণভেদ প্রথা প্রথম প্রবর্ত্তিত হয়। কূর্ম্মপুরাণ ২৮ অধ্যায়ে লিখিত আছে :—

বর্ণাশ্রম ব্যবস্থাশ্চ ত্রেতায়াং কৃতবান্ প্রভুঃ।

অসুরগণের অত্যাচারে দেব ও মানবগণের মধ্যে কেহ কেহ ভারতে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন। ভারতের আদিম অধিবাসিগণের সহিত তাঁহাদের বিবাদ হয়। সুতরাং ভারতবর্ষেও চাতুর্ব্বর্ণ্য প্রচলিত হয়। দ্বাপর যুগে এই বর্ণবিভাগকে দৃঢ় করিয়া সমাজ বন্ধন করা হয় এবং 'বর্ণ' শব্দের পরিবর্ত্তে 'জাতি' শব্দ ব্যবহৃত হয়। কলিযুগে এই জাতিবিচারের কঠোরতা চরমে উঠিয়াছে। ভ্রাতা ভ্রাতাকে অস্পৃশ্য বলিতেছে। গুণকর্ম্মের বিচার ভারতবর্ষ হইতে বিদূরিত হইয়াছে। এমন কি জাতিবিচারে বংশ বা গোত্রের কথাও আর উঠে না। উদাহরণ স্বরূপ ব্রাহ্মণজাতির কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। কান্যকুব্জের কয়েকজন ব্রাহ্মণ বঙ্গদেশে আসিয়া বাস করেন, তাঁহাদের বংশধরগণ বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ নামে পরিচিত। বাঙ্গালী ব্রাহ্মণের কয়েকজন

রাঢ় দেশে বাস করেন, তাঁহারা রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ। আবার কয়েকজন বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ বরেন্দ্রভূমে বসতি স্থাপন করেন, তাঁহারা বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ। কিন্তু অদৃষ্টের প্রহেলিকা এই যে এক্ষণে কান্যকুব্জ, রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্রে কোন সম্পর্ক নাই। তাঁহারা প্রত্যেকে যেন এক একটী পৃথক জাতি। তাঁহাদের কন্যা আদানপ্রদান ত দূরের কথা, একে অন্যের স্পৃষ্ট অন্ন ভক্ষণ করিতেও চান না। জাতিভেদের কি শোচনীয় পরিণাম! অন্যান্য জাতির অবস্থা আরও শোচনীয়। তাহার আলোচনা এস্থলে নিষ্প্রয়োজন।

জাতিবিভাগ যেমন ক্রমপরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া বর্ত্তমান দুরবস্থায় পরিণত হইয়াছে, আমাদের বিবাহ-ব্যাপারটাও সেইরূপ বিধিবিধানের পেষণে পিষ্ট হইয়া বর্ত্তমান অবস্থায় উপনীত হইয়াছে। সেই প্রাচীনকালে অর্থাৎ সত্যযুগে বিবাহের কোন ব্যবস্থাই ছিল না। লিঙ্গ পুরাণ হইতে পূর্ব্বোদ্ধৃত শ্লোকার্দ্ধ তাহার প্রমাণ। পশুপক্ষী সকল যেমন প্রকৃতির শাসনে পরিচালিত হইয়া ভগবানের রাজ্যে প্রজা বৃদ্ধি করিতেছে, নরগণও সেইরূপ করিত। প্রজাবৃদ্ধির জন্যই ভগবান্ স্ত্রী ও পুরুষ সৃষ্টি করিয়াছেন এবং তাহাদের মনে মিলনেচ্ছা দিয়াছেন। মনু সংহিতার ৯ম অধ্যায়ে ৯৬ সংখ্যক শ্লোকে লিখিত আছে :—

প্রজনার্থং স্ত্রিয়ঃ সৃষ্টাঃ সন্তানার্থঞ্চ মানবাঃ।

অর্থাৎ গর্ভধারণের জন্য স্ত্রী ও প্রজাবৃদ্ধির জন্য পুরুষগণ সৃষ্ট হইয়াছে। ভগবানের উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য প্রাচীনকালে নরগণ অবাধে নারীগণের সহিত মিলিত হইত। তখন নারীগণের অবরোধ প্রথা ছিল না বা পুরোহিত ডাকিয়া কেহ বিবাহ করিত না। স্ত্রী-পুরুষের মিলনে কোন বিধি-নিষেধ ছিল না (আদিপর্ব্ব ১২২ অধ্যায়)। কিন্তু এই অবস্থা নরসমাজে দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় নাই।

প্রকৃতির রাজ্যে দেখা যায় স্ত্রী অপেক্ষা পুরুষ বলবান্— গাভী অপেক্ষা বৃষ বলবান্, সিংহী অপেক্ষা সিংহ বলবান্, ময়ূরী অপেক্ষা ময়ূর বলবান্, মোরগী অপেক্ষা মোরগ বলবান্, সেইরূপ নারী অপেক্ষা নর বলবান্। তথাপি ইতর প্রাণীর মধ্যে পুরুষগণ স্ত্রীগণের উপর কোন অত্যাচার করে না, স্ত্রীগণের স্বাধীনতা অপহরণ করিতে চেষ্টা করে না বা স্ত্রীগণের ন্যায্য অধিকারে হস্তক্ষেপ করে না। কিন্তু গভীর পরিতাপের বিষয় এই যে, সত্যযুগের পর নরগণ স্বার্থপর হইয়া নারীগণকে আয়ত্ত করিতে চেষ্টা করিয়াছিল। তাহার ফলে কোন কোন পুরুষ একাধিক স্ত্রী সংগ্রহ করিয়া তাহাদের উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল। সেই হেতু কোন কোন স্থানের পুরুষগণ স্ত্রীর অভাব অনুভব করিয়া অন্য স্থান হইতে স্ত্রীগণকে বহন করিয়া লইয়া পলাইত। উহাই

বিবাহের আদি স্তর। 'বিবাহ' শব্দ বহনার্থক বহ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। এই বহনব্যাপারে বিবাদ-বিসংবাদ মারামারি-কাটাকাটি না হইয়া যাইত না। পৃথিবীর আদিম অধিবাসী রাক্ষসগণ এইরূপে স্ত্রী সংগ্রহ করিত বলিয়া, পরবর্ত্তীকালে উহা 'রাক্ষস' বিবাহ নামে খ্যাত হয়। এই প্রকার বিবাহে অধিক লোকক্ষয় হওয়ায়, পরবর্ত্তী সময়ে দুইটী সভ্য নরসমাজ নূতন দুই প্রকার বিবাহ প্রবর্ত্তিত করেন। তন্মধ্যে দেব-উপাধিধারী নরগণ ব্যবস্থা করেন যে (১) গৃহস্থ যজ্ঞের ঋত্বিক্‌কে তাহার কন্যা দান করিবে। উহাকে 'দৈব' বিবাহ বলে। "যজ্ঞস্থ ঋত্বিজে দৈবঃ" (বিষ্ণু সংহিতা ২৪।২০)। অসুর-উপাধিধারী নরগণ ব্যবস্থা করেন যে (২) কন্যার অভি-ভাবককে কিছু অর্থ দিয়া তাহার সম্মতিক্রমে বিবাহ করা উচিত, তাহা হইলে বিবাদবিসংবাদের সম্ভাবনা থাকিবে না। এই প্রথাকে 'আসুর' বিবাহ বলে। "আসুরোদ্রবিণাদানাৎ..." (যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা ১।৬১)। উহাতে বিবাহে যুদ্ধবিগ্রহ একবারে রহিত না হইলেও, কতকগুলি বিবাহ নিরাপদে সম্পন্ন হইল। কিন্তু এক পুরুষের একাধিক স্ত্রীসংগ্রহ নিবারিত হইল না, সুতরাং সকল পুরুষের ভাগ্যে স্ত্রী জুটিল না। তখন বহু পুরুষ মিলিয়া এক স্ত্রীকে বিবাহ করিবার প্রথা প্রচলিত

এষ ধর্ম্মো ধ্রুবো রাজংশ্চরৈন মবিচারয়ন্

* * * * * *

শ্রূয়তে হি পুরাণেঽপি জটিলা নাম গৌতমী।
ঋষীনধ্যাসিতবতী সপ্ত ধর্ম্মভৃতাং বরাঃ॥
তথৈব মুনিজা বার্ক্ষী তপোভির্ভাবিতাত্মনঃ।
সঙ্গতাভূৎ দশভ্রাতৃনেক নাম্নঃ প্রচেতসঃ॥ আদিপর্ব্ব।

ঋষিকন্যা জটিলা এবং মুনিকন্যা বার্ক্ষী একবারে বহু স্বামীকে বিবাহ করিয়া ছিলেন। উহাই পূর্ব্বে ধর্ম্ম ছিল। তখন পুরুষগণ স্ত্রীগণের সতীত্ব সম্বন্ধে কোন আলোচনা করিতেন না। সতীত্বের গবেষণা তখন তাঁহাদের মস্তিষ্কে স্থান লাভ করে নাই।

একদিন মহর্ষি শ্বেতকেতু তাঁহার মাতাপিতার নিকটে উপবিষ্ট আছেন, এমন সময় এক ব্রাহ্মণ তাঁহার মাতার হস্ত ধারণ করিয়া স্থানান্তরে গমন করিল। তাহা দেখিয়া শ্বেতকেতু ক্রুদ্ধ হইলেন। তখন শ্বেতকেতুর পিতা মহর্ষি উদ্দালক বলিলেন, "পুত্র, তুমি কুপিত হইও না। ইহাই সনাতন ধর্ম্ম। অঙ্গনাগণ অবারিতা। গোগণ যেরূপ আচরণ করে, সকল বর্ণের মনুষ্যগণই সেই আচরণ করিয়া থাকে।" ইহা শুনিয়া শ্বেতকেতু সেই দিন নিয়ম স্থাপন করিলেন যে, ভর্ত্তাকে যে নারী অতিক্রম করিয়া ব্যভিচারিণী হইবে, তাহার ভ্রূণহত্যা

পাতক হইবে এবং যে পুরুষ স্বীয় পত্নীকে অতিক্রম করিয়া পরনারী সম্ভোগ করিবে তাহারও সেই পাতক হইবে।

ব্যুচ্চরন্ত্যাঃ পতিং ভার্য্যা অদ্য প্রভৃতি পাতকম্॥
ভ্রূণহত্যা সমং ঘোরং ভবিষ্যত্যসুখাবহং।
ভার্য্যাং তথাব্যুচ্চরতঃ কৌমার ব্রহ্মচারিণাম্॥

(মহাভারত, আদিপর্ব্ব, ১২২ অধ্যায়)।

শ্বেতকেতুর বিধানে কোন পক্ষপাতিত্ব ছিল না। তিনি ব্যবস্থা করিয়াছিলেন স্ত্রী বা পুরুষ কেহই যেন ব্যভিচার না করে। তাঁহার এই বিধান সকলে মান্য করিলে এই অশান্তিময় জগতে শান্তি স্থাপিত হইত। কিন্তু তদানীন্তন নরসমাজের স্ত্রী বা পুরুষ কেহই এই কঠোর বিধির অধীন হইয়া থাকিতে চায় নাই—কেহই স্বেচ্ছাচারিতাকে সঙ্কুচিত করিয়া নিয়মের গণ্ডিতে আবদ্ধ হইতে স্বীকৃত হয় নাই। শেষে পুরুষগণ ভাবিল, স্ত্রীগণকে যদি এই নিয়মে আবদ্ধ করা যায়, তাহা হইলে পুরুষের সুখস্বচ্ছন্দতার বৃদ্ধি হইতে পারে। তখন পুরুষগণ স্বয়ং সেই ঋষিকৃত নিয়মে আবদ্ধ না থাকিয়া, স্ত্রীগণকে অল্পে অল্পে বাঁধিতে চেষ্টা করিল। সতীত্বের একটা অস্পষ্ট ধারণা কাহারও কাহারও মস্তিষ্কে বীজাকারে প্রবেশ করিল।

প্রথমে নারীগণের বহুস্বামিত্ব নষ্ট করিবার জন্য বেদে মন্ত্র রচিত হইল, "নৈকস্যৈ বহবঃ সহপতয়ঃ।" অর্থাৎ একটী স্ত্রী

এক সময়ে বহু পুরুষকে বিবাহ করিতে পারিবে না। তাহাতে স্ত্রীগণ কোন আপত্তি করে নাই, করিবার আবশ্যকতাও ছিল না। কিন্তু যখন স্ত্রীগণের স্বচ্ছন্দ বিহারের প্রথা রহিত করিবার জন্য পুরুষগণ সচেষ্ট হইল, তখন স্ত্রীগণ তাহা নীরবে সহ্য করে নাই। সহসা তাহাদের আপত্তি অগ্রাহ্য করিয়া কোন কঠিন নিয়ম স্থাপন করিতেও পুরুষগণ সাহসী হয় নাই। তখন অগত্যা পুরুষগণ স্বীকার করিতে বাধ্য হইল, "ন স্ত্রী দুষ্যতি জারেন, (অত্রি ১৮৯)।" কিন্তু নারীগণের স্বেচ্ছাচারিতা ক্রমে ক্রমে দমন করিবার জন্য চেষ্টা চলিতে লাগিল। প্রথমে একটী মৃদু ব্যবস্থা করা হইল, "রজসা শুধ্যতে নারী, (অঙ্গিরা ৪২)।" এই বিধানে নারীর স্বাধীনতা কথঞ্চিৎ ক্ষুন্ন হইলেও, তাহা তাহাদের অসহনীয় হয় নাই। এই ব্যবস্থাবলে মহর্ষি বৃহস্পতি চন্দ্রভুক্তা তারাকে [illegible] এবং [illegible]। ক্রমে মানবগণের মস্তিষ্কের ক্রমবিকাশে সুখ-স্বচ্ছন্দতার ধারণা অধিকতর পরিপুষ্ট হওয়ায়, তাহারা আপনাদের স্বার্থ বুঝিতে পারিল এবং পুরুষের স্বার্থের সহিত নারীশাসনের কি সম্বন্ধ, তাহাও হৃদয়ঙ্গম করিল। তখন পুরুষগণ স্ত্রীগণের স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপ করিবার জন্য অধিকতর যত্ন করিতে লাগিল।

এই সময়ে নারীগণের দুর্ভাগাবশে ভারতবর্ষে দীর্ঘতমা নামে এক ব্রাহ্মণ প্রাদুর্ভূত হন। তিনি জন্মান্ধতাবশতঃ পত্নীর

উপার্জ্জনের দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন। তিনি অত্যন্ত কদাচারী ছিলেন। তাঁহার কুব্যবহারে বিরক্ত হইয়া তাঁহার প্রতিবেশী ঋষিগণ তাঁহাকে নির্ব্বাসিত করিবার ব্যবস্থা করেন। তাঁহার পত্নীও তাঁহার উপর বিরক্ত ছিলেন। একদিন দীর্ঘতমা তাঁহার পত্নীকে ধনাহরণ জন্য এক ক্ষত্রিয় রাজার নিকট যাইতে আদেশ করেন। পত্নী তাহাতে অসম্মত হইয়া বলিলেন, আমি আর তোমার ভরণ পোষণ জন্য পরিশ্রম করিতে পারি না। তুমি ভর্ত্তা, তুমি আমার ভরণ পোষণ করিবে। তাহা না হইয়া, তোমার ভরণ পোষণ ভার আমাকেই বহন করিতে হইতেছে। তুমি এক্ষণে যাহা ইচ্ছা হয় কর, আমি তোমার অপেক্ষা রাখি না। আমি অন্য ভর্ত্তা করিব।" দীর্ঘতমা এই অপ্রত্যাশিত উত্তর প্রাপ্ত হইয়া ক্রুদ্ধ হইলেন। তাঁহার পত্নী তাঁহাকে ব্যভিচারের ভয় দেখাইয়া ছিলেন, সেইজন্য তিনি সমস্ত স্ত্রীজাতির উপর যেন বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "আমি অদ্য হইতে এই নিয়ম স্থাপন করিলাম যে নারী একমাত্র পতিকেই যাবজ্জীবন আশ্রয় করিবে, স্বামী জীবিত থাকুক বা মৃত হউক, স্ত্রী অন্য পুরুষ গমন করিতে পারিবে না; পরপুরুষ গমন করিলে নারী পতিতা হইবে।"

মৃতে জীবতি বা তস্মিন্নাপরং প্রাপ্নুযান্নরম্।
অভিগম্য পরং নারী পতিষ্যতি নসংশয়ঃ॥

দীর্ঘতমা পুরুষগণের সম্বন্ধে নীরব থাকিয়া, নারীগণের ব্যভিচারমাত্র নিষেধ করিয়াছিলেন, কিন্তু পুরুষগণের মানসক্ষেত্রে সতীত্বের ধারণা উহাতে অঙ্কুরাবস্থা ত্যাগ করিয়া পল্লবিত হইল। তৎপরে "রজসা শুধ্যতে নারী" এই বিধানের অর্থ করা হইল, "রজসা স্ত্রী মনোদুষ্টা।" (বিষ্ণু সংহিতা ২২।৯০)। নারীগণের কর্ণে সতীত্বের মাহাত্ম্য দিবানিশি বর্ষিত হইল। স্ত্রীগণ পুরুষের অধীনতা সহ্য করিতে অভ্যস্ত হইল। তাহারা সতী হইতে ও সতীত্ব রক্ষা করিতে চেষ্টা করিল। পুরুষের মনস্তুষ্টি নারীগণের জীবনের ব্রত হইল। শেষে এই ভারতবর্ষে পুরুষগণের ঈপ্সিত সতী নারীর আবির্ভাব হইল। সতীত্বের জন্য নারী মৃতপতির চিতায় প্রাণ বিসর্জ্জন দিল। দেব মানব বিস্ময়ে অভিভূত হইল। সতীত্বের বিজয়ঢক্কা গ্রামে গ্রামে নিনাদিত হইল। কঠিনহৃদয় পুরুষগণ বিধবা নারীকে অগ্নিতে দগ্ধ হইতে দেখিয়া আনন্দে বিভোর হইল। গর্ব্বে তাহাদের বক্ষ স্ফীত হইল। কেহ বিধবাদিগকে দগ্ধ হইতে উপদেশ দিল। কেহবা জোর করিয়া বিধবাগণকে পোড়াইবার ব্যবস্থা করিল। রোরুদ্যমানা বিধবাকে কেহ বলপূর্ব্বক চিতায় শোয়াইয়া দিল। বিধবার আর্ত্তনাদ কেহ শুনিতে না পায়, সেইজন্য ঢাকঢোল, শঙ্খঘণ্টাদির ব্যবস্থা হইল। অগ্নির তাপে অনাথা ছটফট না করে, সেই উদ্দেশ্যে সিদ্ধি ধুতুরা অহিফেন

প্রচুর মাত্রায় সেবন করাইয়া জ্ঞানহীন অবস্থায় বিধবাকে শ্মশানে লইয়া যাওয়া হইল। এই নৃশংস কার্য্যের প্রতিবাদ করিবার কেহ ছিল না। নারীগণ তখন পুরুষগণের অধীনতা-পাশে বদ্ধ হইয়া অবৈতনিক দাসীতে পরিণত হইয়াছিল। কিন্তু উদারহৃদয় ঋষিগণ বিধবাগণকে রক্ষা করিবার জন্য গাহিলেন :—

উদীর্ষ্ব নার্য্যভিজীবলোক মিতাসুমেতমুপশেষ এহি
হস্তগ্রাভস্য দিধিষোস্তবেদং পত্যুর্জ্জনিত্বমভি সম্বভূব।

যজুর্ব্বেদ, ঋগ্বেদ।

(অর্থাৎ হে নারি, চিতা হইতে উঠিয়া সংসারের দিকে চল এবং পুনরায় বিবাহ করিয়া সুখে জীবন অতিবাহিত কর)। ঋষিগণের এই আহ্বানে কতকগুলি বিধবার প্রাণ রক্ষা হইল।

যদিও সতীত্বের মাহাত্ম্যে ভারতের পল্লীভবন মুখরিত হইল, ব্রাহ্মপ্রাজাপত্যাদি অষ্টপ্রকার বিবাহ (বিষ্ণু সংহিতা ২৪।১৭) সমাজে প্রচলিত হইল, কিন্তু প্রাচীনরীতি সমাজ হইতে একবারে অন্তর্হিত হয় নাই। বিবাহে কন্যা সধবা কি বিধবা, কুমারী কি যুবতী, তাহার কোন বিচার হইত না। এমন কি লোকে সগর্ভা ও পুত্রবতী কন্যাকেও বিবাহ করিত। রাজর্ষি বিশ্বামিত্র পুত্রবতী মাধবীর পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন (উদ্যোগপর্ব্ব ১১৫ অধ্যায়)। শান্তনু পুত্রবতী কালীকে (মৎস্যগন্ধাকে) এবং পাণ্ডু

পুত্রবতী কুন্তীকে যে বিবাহ করিয়া ছিলেন, তাহা এই প্রথার শেষ নিদর্শন। কেবল তাহাই নহে, সে সময়ে আর্য্যগণের জনসংখ্যা বৃদ্ধি করা আবশ্যক হেতু, পুত্রহীনা স্ত্রীগণ স্বামী বা স্বামীর মরণে গুরুজনের অনুমতি গ্রহণ করিয়া, অন্য পুরুষ দ্বারা পুত্র উৎপাদন করাইয়া লইতেন। তাহাতে তাঁহাদের সতীত্ব নষ্ট হইত না। সেই প্রথাকে নিয়োগবিধি বলে (মনু ৯।৫৯)। প্রাচীন ভারতে ক্ষেত্রজ পুত্র তাহার উদাহরণস্থল। ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডু ও পাণ্ডুর পুত্রগণ স্ব স্ব পিতার ক্ষেত্রজ পুত্র ছিলেন। ক্রমে সতীত্বের ভাব রূপান্তর গ্রহণ করিয়া ফলপুষ্পে সুশোভিত হইল। স্ত্রী পুরুষের মধ্যে একটা পারলৌকিক সম্বন্ধ স্থাপন করা হইল। স্বর্গে ভারতবাসী পুরুষগণের জন্য একটা পতিলোক আবিষ্কৃত হইল। ঔরস ব্যতীত সর্ব্বপ্রকার পুত্র নিন্দনীয় হইল। নিয়োগবিধি একবারে রহিত না হইলেও, হেয় হইল। পুরুষের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি এড়াইয়া, সমাজে ভ্রূণহত্যা ব্যভিচার প্রভৃতি পাপ ধীরে ধীরে প্রবেশ করিল। ক্ষমতাশালী লোকের গৃহে ভ্রূণহত্যা বা ব্যভিচার ঘটিলে, তাহা সহজে গোপন করা হইত অথবা তাহাতে একটা অলৌকিকতার আরোপ করিয়া, সাধারণ লোককে প্রতারিত করা হইত। এইজন্য কুন্তীর বিবাহের পূর্ব্বে যে তাঁহার গর্ভে পুত্র উৎপন্ন হইয়াছিল তাহা সে সময়ে

সকলে জানিতে পারে নাই। কথাটা যখন প্রকাশিত হইল তখন তাহাতে একটা অলৌকিকত্ব সংযুক্ত করা হইল। ধৃষ্টদ্যুম্ন ও দ্রৌপদীর জন্মের সহিতও একটা অলৌকিক গল্প জড়িত আছে। বস্তুতঃ তাঁহাদের জন্মও সেই হেয় নিয়োগ প্রথায়।

ভারতীয় পুরুষগণের মনে সতীত্বের ভাব বদ্ধমূল হওয়ায়, তাহারা সতীত্ব শব্দের অর্থ করিল একপতিত্ব। বস্তুতঃ সতীত্ব শব্দের অর্থ একপতিত্ব নহে। সৎ শব্দের স্ত্রীলিঙ্গে সতী শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। সুতরাং সৎ শব্দের যে অর্থ সতী শব্দেরও তাহাই অর্থ। সৎ শব্দের পারমার্থিক অর্থ—নিত্য, শাশ্বত, চিরস্থায়ী অর্থাৎ ব্রহ্ম। সৎ শব্দের লৌকিক অর্থ সাধু। আমরা কোন স্ত্রীকে পারমার্থিক অর্থে সতী বলিতে পারি না, কারণ স্ত্রী মাত্রেই জন্ম, জরা ও মৃত্যুর অধীন, কোন স্ত্রীই নিত্য, শাশ্বতী বা চিরস্থায়িনী নহে। তাহার স্থূল সূক্ষ্ম ও কারণ শরীর প্রতিনিয়ত পরিবর্ত্তিত হইতেছে। একমাত্র ব্রহ্মই লীলার্থে জগদ্রূপে বিবর্ত্তিত হইয়াছেন। ব্রহ্মই সৎ, নামরূপাত্মক পদার্থ মাত্রেই অসৎ। সুতরাং স্ত্রীর স্ত্রীত্ব অসৎ, তাহার ব্রহ্মত্বই সৎ। পুরুষের পুংস্ত্বও অসৎ তাহার ব্রহ্মত্বই সৎ। অতএব পারমার্থিক অর্থে কোন স্ত্রীকে সতী বা কোন পুরুষকে সৎ বলা যায় না। লৌকিক অর্থে যে ভাবে পুরুষকে

সৎ বা সাধু বলা যায়; স্ত্রীকেও সেইভাবে সতী বা সাধ্বী বলা যাইতে পারে। অর্থাৎ যে যে গুণ থাকিলে পুরুষকে সৎ বা সাধু বলা যায়, স্ত্রী সেই সেই গুণে ভূষিতা হইলে তাহাকেও সতী বা সাধ্বী বলা যাইতে পারে। পুরুষের যে যে দোষ থাকিলে তাহাকে অসৎ বা অসাধু আখ্যায় অভিহিত করা যায়, স্ত্রীলোকের সেই সেই দোষ থাকিলে তাহাকেও অসতী বা অসাধ্বী বলা যাইতে পারে। পুরুষের একপত্নিকত্ব যেমন সাধুতার লক্ষণ নহে, স্ত্রীর একপতিত্বও সেইরূপ সতীত্বের লক্ষণ নহে। সৎ পুরুষের পত্নীপ্রেম যেমন প্রশংসার্হ, সতী স্ত্রীর স্বামিভক্তিও সেইরূপ বাঞ্ছনীয়। বিপত্নীক সৎপুরুষের পক্ষে পত্নীশোকে আত্মহত্যা যেমন নিষ্প্রয়োজন, বিধবা সতী নারীর পক্ষে স্বামিবিরহে বহ্নিপ্রবেশও সেইরূপ অনাবশ্যক সৎপুরুষের পরদারপ্রসঙ্গ যেমন কুকর্ম্ম, সতী স্ত্রীর পরপুরুষ-লালসাও সেইরূপ অপকর্ম্ম। ব্যভিচার সৎপুরুষের যেমন বর্জ্জনীয়, সতী স্ত্রীর পক্ষেও তদ্রূপ। কিন্তু দ্বিতীয় বিবাহ স্ত্রী বা পুরুষের পক্ষে ব্যভিচার নহে। অবদাতচরিত্র পুরুষ ও অবদাতচরিত্রা নারী উভয়েই নরলোকের আদর্শ। সাধু পুরুষ সমাজের অলঙ্কার, সাধ্বীনারী সমাজের ভূষণস্বরূপা। সৎপুরুষ ও সতী নারী পৃথিবীকে স্বর্গে পরিণত করে। দ্বিতীয়

সহায়ক। দ্বিতীয় বিবাহ বিপত্নীক পুরুষের চরিত্ররক্ষার পক্ষে সাহায্য করে, তাহার বংশ বৃদ্ধি করে এবং তাহার হৃদয়-মরুতে ভাবের কুসুম ফুটাইয়া তুলে। বিধবাবিবাহ বিধবা স্ত্রীরও চরিত্ররক্ষায় সাহায্য করে, তাহার মাতৃত্বের বিকাশ করে, তাহার হতাশ হৃদয়ের বিশুষ্ক আশালতাকে পল্লবিত করে। কিন্তু পুরুষগণ নিরপেক্ষভাবে এই সকল কথা আলোচনা না করিয়া "সতী" শব্দের একটা স্বকপোলকল্পিত অর্থ সৃজন করিয়া, নারীশাসন কার্য্যে ব্রতী হইল। ক্রমে তাহারা সতীত্ব শব্দের আরও সঙ্কীর্ণ অর্থ কল্পনা করিয়া, অনন্যপূর্ব্বা কন্যাকে বিবাহ করিতে বাসনা করিল। সুতরাং বাগ্‌দত্তা, মনোদত্তা, বিবাহিতা ও বিধবা কন্যাগণ বিবাহে বঞ্চিত হইল। তাহাদিগকে যাহারা বিবাহ করিল তাহারা সমাজে নিন্দনীয় হইল। তাহাদের একটা নূতন বিশেষণ হইল পুনর্ভূ অর্থাৎ দ্বিতীয় পক্ষ। তাহাদের পুত্রগণকে পৌনর্ভব সংজ্ঞায় অভিহিত করা হইল। পূর্ব্বকালে স্বামী স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিয়া যেমন অন্য স্ত্রীকে বিবাহ করিত, স্ত্রীও অবস্থা বিশেষে স্বামীকে পরিত্যাগ করিয়া অন্য পুরুষকে বিবাহ করিতে পারিত; এমন কি দীর্ঘ প্রবাসী স্বামীকে ত্যাগ করিয়া নারী অপর পুরুষকে বিবাহ করিত। নারদ স্মৃতিতে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়, "অতোহন্যগমনে স্ত্রীনামেষদোষো ন বিদ্যতে।"

পূর্ব্বে বিধবাগণ এমন কি পুত্রবতী বিধবাগণ পুনরায় বিবাহ করিতেন, তাহার ব্যবস্থা এখনও মনুসংহিতায় বিদ্যমান আছে :—

যা পত্যাবা পরিত্যক্তা বিধবা বা স্বয়েচ্ছয়া……

সা চেদক্ষত যোনিস্যাদ্‌গত প্রত্যাগতা পিবা

পৌনর্ভবেন ভর্ত্রাসা পুনঃ সংস্কার মর্হতি ॥

যৌতু যৌ বিবদেয়াতাং দ্বাভ্যাং জাতৌ স্ত্রিয়াধনে

তয়োর্যদ্‌ যস্ত পিত্র্যং স্যাত্তৎসগৃহ্নীত নেতরং ॥

অর্থাৎ অক্ষতযোনি বিধবার পুনরায় বিবাহ করা উচিত। কোন পুত্রবতী বিধবা পুনরায় বিবাহ করিয়া নূতন স্বামী দ্বারা পুত্র উৎপাদন করিলে, ভিন্ন ভিন্ন স্বামী দ্বারা উৎপাদিত তাহার পুত্রগণ স্ব স্ব পৈত্রিক সম্পত্তি পাইবে। বিধবাগণ বিবাহ করিলে স্বর্গ পতিলোকের লোকসংখ্যা যে কমিবে না, তদ্বিষয়ে ঋষিগণ পুরুষগণকে আশ্বাস দিয়া অথর্ব্ববেদে মন্ত্র রচনা করিয়াছিলেন :—

সমান লোকো ভবতি পুনর্ভুবা পরঃ পতিঃ।

অর্থাৎ বিধবা পুনরায় বিবাহ করিলে সে নবপতিসহ পতিলোক প্রাপ্ত হইবে। বেদও স্মৃতিতে উদারমতি ঋষিগণ বিধবার পুনর্ব্বিবাহে বিধান দিয়াছিলেন, কিন্তু ভারতীয় পুরুষগণ "পুনর্ভূ" হইবার ভয়ে, লোকলজ্জার খাতিরে বিধবাকে

বিবাহ করিতে চাহিল না। তথাপি বিধবাবিবাহ একেবারে রহিত হয় নাই। মহাভারতে বনপর্ব্বে দেখিতে পাওয়া যায় দময়ন্তী দ্বিতীয়বার স্বয়ম্বর করিবেন প্রচার করিয়াছিলেন :—

স্যূর্য্যোদয়ে দ্বিতীয়ং সা ভর্ত্তারং বরয়িষ্যতি।
নহি স জ্ঞাতয়ে বীরো নলো জীবতি বা নবা॥

অর্থাৎ নল জীবিত বা মৃত তাহা দময়ন্তী জানিতে পারিতেছেন না, তিনি পুনরায় স্বয়ম্বর করিয়া দ্বিতীয় স্বামী গ্রহণ করিবেন। অযোধ্যাধিপতি স্যূর্য্যবংশীয় রাজা ঋতুপর্ণ দময়ন্তীকে পুনরায় বিবাহ করিবার জন্য গমন করিয়াছিলেন। দময়ন্তীর মনোভাব যাহাই থাকুক না কেন, উহাতে তৎকালে বিধবাবিবাহ প্রথার অস্তিত্ব সপ্রমাণ হয়। মহাভারতের ভীষ্মপর্ব্বেও লিখিত আছে যে অর্জ্জুন ঐরাবতের বিধবা বধূকে বিবাহ করিয়াছিলেন।

পুরুষগণ তথাকথিত অন্যপূর্ব্বা কন্যাগণকে বিবাহ করিতে অস্বীকৃত হওয়ায়, তাহার ফল অতি বিষময় হইল। রূপের তৃষ্ণায় ও যৌবনের ক্ষুধায় কাতর হইয়া, সেই অন্যপূর্ব্বা অর্থাৎ মনোদত্তা, বাগ্‌দত্তা ও বিধবা নারীগণ ব্যভিচার ও ভ্রূণহত্যার পাপে দেশকে ডুবাইতে বসিল। সমাজের ভয় বা পুরুষের শাসন তাহার বেগ রোধ করিতে পারিল না। তখন ঋষিগণের আদেশে পুরুষগণ বাধ্য হইয়া বাগ্‌দত্তা ও মনোদত্তা

কন্যাগণকে বিবাহ করিল। মনুস্মৃতি যে অক্ষতযোনি বিধবার বিবাহ ব্যবস্থা দিয়াছিলেন, সেই অক্ষতযোনি শব্দের প্রকৃত অর্থ অব্যভিচারিণী (পত্যন্তরেণ অসংস্পৃষ্টা ইতি সর্ব্বজ্ঞ নারায়ণ অর্থাৎ যে বিধবা স্বীয় স্বামী ব্যতীত অন্য পুরুষের সহিত মিলিত হইয়া পাপাচরণ করিয়াছে সে বিবাহে অযোগ্যা। কিন্তু যে নারী স্বীয় স্বামীর প্রতি আসক্তা থাকিয়া দৈবক্রমে বিধবা হইয়াছে তাহার পুনর্ব্বিবাহ মনু নিষেধ করেন নাই; পরন্তু তিনি পুত্রবতী বিধবারও পুনর্ব্বিবাহের ব্যবস্থা দিয়াছেন তাহা পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে।) কিন্তু অভিমানী পুরুষগণ সেই অক্ষতযোনি শব্দের একটা সঙ্কীর্ণ অর্থ করিয়া, কেবল অপ্রাপ্তমৈথুনা বালবিধবাকে বিবাহ করিতে সম্মত হইল। অথচ যে বিধবা বিবাহ করিল, তার সেই নিন্দনীয় পুনর্ভূ বিশেষণটা লোপ পাইল না; কারণ ইতি মধ্যে যাজ্ঞবল্ক্য ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, "অক্ষতা বা ক্ষতা বাপি পুনর্ভূঃ সংস্কৃতা পুনঃ। সুতরাং লোকে বিধবাবিবাহকে ঘৃণার চক্ষে দেখিয়া স্বস্ব গৃহের পাপে জর্জ্জরিত হইয়া নরকের পথ পরিষ্কার করিতে সম্মত ছিল, তথাপি ঋষিবাক্য শিরোধার্য্য করিয়া বিধবাবিবাহ করিয়া সৎসাহস দেখাইতে কুণ্ঠিত হইল। কলির আগমনে লোকের মতিভ্রম হইতে লাগিল।

এই সময় রঘুকুল-পুরোহিত বশিষ্ঠের বংশে মহর্ষি পরাশর

ইনি ঋষিসমাজে বিশেষ খ্যাতি লাভ করেন। স্বয়ং বেদ ইহার প্রশংসা করিয়াছেন। ইনি প্রসিদ্ধ বিষ্ণু পুরাণের বক্তা। ইহারই ঔরসে জগদ্বিখ্যাত কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস জন্মলাভ করেন। সেই মহাতপা মহর্ষি পরাশর দেখিলেন হিন্দু-সমাজের অবস্থা অতি শোচনীয়। যাহাতে পুরুষগণ নির্ব্বিরোধে স্ত্রী-সংগ্রহ করিয়া ভগবানের রাজ্যে প্রজা বৃদ্ধি করিতে পারে, সেই উদ্দেশ্যে পূর্ব্বতন ঋষিগণ বিবাহের ব্যবস্থা করিয়াছেন, কিন্তু স্বার্থপর পুরুষগণ পক্ষপাত বিচার করিয়া বিধবা নারীকে প্রজননকার্য্য হইতে বিরত রাখিয়াছে এবং সঙ্গে সঙ্গে ব্যভিচার ও ভ্রূণহত্যা পাপের কারণ হইয়া ভগবদিচ্ছার বিরুদ্ধে কার্য্য করিতেছে। তাহারা স্বীয় মতের পরিপুষ্টি জন্য প্রাচীন ঋষির উদার ব্যবস্থার সংকীর্ণ অর্থ করিতেছে। এ বিখ্যাত আর্য্য জাতি এরূপ পাপাচারণে রত হইলে, উহার দীর্ঘজীবন আশা করা অসম্ভব। তখন কলিযুগ-ধর্ম্মজ্ঞাতা উদারমতি পরাশর সমাজ হইতে সেই নিন্দাসূচক পুনর্ভূ শব্দটা তুলিয়া দেওয়ার জন্য, বিধবা বিবাহোৎপন্ন পুত্রকে ঔরস পুত্ররূপে গণ্য করিবার জন্য, ক্ষতাক্ষতযোনির বিচার রহিত করিবার জন্য, নারীকে তাহার ন্যায্য ভগবদ্দত্ত অধিকার পুনঃ প্রদান করিবার জন্য, এবং সমাজে পাপের খরস্রোত প্রতিরোধ করিবার জন্য, সুস্পষ্ট ভাষায় ব্যবস্থা করিলেন :—

নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবেচ পতিতে পতৌ।
পঞ্চস্বাপৎসু নারীনাং পতিরন্যো বিধীয়তে॥

অর্থাৎ পতি নিরুদ্দেশ হইলে, মৃত হইলে, সন্ন্যাসী হইলে, ক্লীব বলিয়া প্রতিপন্ন হইলে কিম্বা পতিত হইলে, এই পঞ্চপ্রকার আপদে স্ত্রীগণ পুনরায় অন্যপতি গ্রহণ করিবে। পাপে ভরা পৃথিবী হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল। বিধবাবিবাহ আবার অবাধে প্রচলিত হইল। মহর্ষি পরাশর যদিও বিধবাগণের জন্য ত্রিবিধ ব্যবস্থাই করিয়াছেন বিধবাবিবাহ, ব্রহ্মচর্য্য ও সহমরণ তিনি কলির বিধবাগণের ও পুরুষগণের চরিত্র ও মানসিক বিষয় বিবেচনা করিয়া প্রথমেই বিধবা-বিবাহের ব্যবস্থা দিয়াছেন।

কিন্তু আভিজাত্যগর্ব্বে স্ফীতবক্ষা সম্পত্তিশালী লোক সকল অনায়াসে কুমারী কন্যা বিবাহ করিতে পাইত, এমন কি অনেকে চরণে ধরিয়া তাহাদিগকে কন্যাদান করিত, সুতরাং বিধবা বিবাহে তাহাদের আবশ্যকতা ছিল না। একজন্য তাহাদের বাটীতে বিধবাবিবাহ একরূপ অপ্রচলিত থাকে। তাহারা ঐশ্বর্য্যমদে মত্ত থাকিয়া স্ব স্ব পরিবারস্থা বিধবাগণের ব্যভিচার বিষয়ে চিন্তা করিবার অবকাশ পায় নাই। কিন্তু তাহাদের বাটীতে বিধবাবিবাহ অপ্রচলিত দেখিয়া সাধারণ লোকে ভাবিল

আভিজাত্যের একটা লক্ষণ। তখন ক্রমে তাহারাও বিধবা-বিবাহ ত্যাগ করিল। আবার বিধবাবিবাহ ঘৃণিত গণ্য হইল। তৎপরে ভারতের বৌদ্ধধর্ম্ম প্রবল হয় এবং বিধবা-বিবাহ আবার চলিতে থাকে, সহমরণ বিদূরিত হয়। গুপ্ত রাজ-গণের সময় হিন্দুধর্ম্মের পুনরুত্থানের সঙ্গে সঙ্গে বিধবাগণের দুর্দ্দশার একশেষ হয়। সহমরণ পুনঃ প্রবর্ত্তিত হইল। বিধবাবিবাহ নিবারিত হইল। ভারতের পুরুষগণ মহর্ষির মহাবাক্যের মর্ম্ম গ্রহণ করিল না। আপনাদের পরিণাম ভাবিল না। নারীর দুঃখ বুঝিল না। সমাজের দুর্দ্দশা দেখিল না। পাপের তাণ্ডব নর্ত্তনে বিচলিত হইল না। তাহারা প্রাচীন ঋষিগণের অবমাননা করিয়া, বেদ ও স্মৃতির কদর্থ করিয়া, নিজের পদে নিজেই কুঠারাঘাত করিবার জন্য, উপপুরাণ রচনা করিতে বসিল। যে সম্পূর্ণ উপপুরাণ প্রণয়ন করিতে অক্ষম হইল, সে অন্ততঃ দুই একটা শ্লোক প্রস্তুত করিয়া প্রাচীন ঋষির রচিত গ্রন্থে প্রক্ষিপ্ত করিল। তাহারা সংসারের যাবতীয় কার্য্যে অবহেলা করিয়া এমন কি, স্বদেশ রক্ষায় উদাসীন থাকিয়া, এক নারী-শাসন-কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিল। হায় তাহারা একবার চিন্তা করিল না—বিপত্নীক পুরুষ যদি পুনরায় বিবাহ করিয়া অসৎ না হয়, তবে বিধবা নারী পুনরায় বিবাহ করিয়া অসতী হইবে কেন? যদি বিপত্নীক

পুরুষ পুনরায় বিবাহ করিয়া নববধুকে মনপ্রাণ দিতে পারে, তবে বিধবা নারী পুনরায় বিবাহ করিয়া নব স্বামীকে মনপ্রাণ দিতে পারিবে না কেন? যদি বিপত্নীক পুরুষ পুনর্ব্বার বিবাহ করিলে নববধূর পরপুরুষ-সঙ্গ না হয়, তবে বিধবা নারী পুনরায় বিবাহ করিলে নবস্বামীর পরনারী-সঙ্গ ঘটিবে কিরূপে? যদি বিপত্নীক পুরুষ পুনরায় বিবাহ করিলে আদর্শের ক্ষতি না হয়, তবে বিধবা নারী পুনরায় বিবাহ করিলে আদর্শ নষ্ট হইবে কেন? যদি পুরুষ জ্ঞান ও বুদ্ধিবলে বলীয়ান্ হইয়াও বিপত্নীক অবস্থায় ব্রহ্মচর্য্য রক্ষায় অক্ষম হয়, তবে অবলা নারীগণ বিধবাবস্থায় কিরূপে ব্রহ্মচর্য্য রক্ষা করিবে? পুরুষগণ একবারও আপনাদের অবস্থার সহিত নারীগণের অবস্থার তুলনা করিল না। তাহারা পক্ষপাতদুষ্ট কুতর্কের অবতারণা করিয়া ধর্ম্ম, সমাজ ও রাজনীতিকে পদদলিত করিল। ধর্ম্মকে অধর্ম্ম এবং অধর্ম্মকে ধর্ম্ম ভাবিয়া পাপপঙ্কে নিমজ্জিত হইল। কুসংস্কারে অন্ধ হইয়া পাপকে পাপ বলিয়া চিনিতে না পারিয়া, পাপ মধ্যেই জীবন অতিবাহিত করিতে সচেষ্ট হইল। পাপের জ্বালায় সমাজ অন্তঃসারশূন্য হইল। দেবতার অভিসম্পাত ভারতবাসীর মস্তকে পতিত হইল। ভারত মুসলমানের করতলগত হইল।

মুসলমানের একতা ও স্বজাতি-প্রীতি অতুলনীয়। তাহাদের

বিবাহ-প্রথা তাহাদের মধ্যে প্রচলিত আছে। কিন্তু স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রীস্বাধীনতা বিষয়ে তাহাদের মত উদার নহে। তাহাদের স্বধর্ম্মানুরাগ প্রশংসার্হ হইলেও, পরধর্ম্মদ্বেষে তাহাদের হৃদয় সঙ্কীর্ণ। সুতরাং মুসলমানের অধীনতা হিন্দুর পক্ষে হিত-জনক নহে ভাবিয়া, ভগবান ভারতে মুসলমান রাজত্বের অবসান ঘটাইলেন। ইংরাজগণ সোণার শৃঙ্খলে ভারত-জননীকে আবদ্ধ করিয়া তাহার শাসনভার গ্রহণ করিলেন। তাঁহাদের রাজত্বকালে. মহাত্মা রামমোহন রায় বিধবাগণের সহমরণ নিন্দনীয় বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। প্রাতঃস্মরণীয় পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর হিন্দুর শাস্ত্র সিন্ধু মন্থন করিয়া প্রমাণ করিয়াছেন—কলিতে বিধবাগণের পুনর্ব্বিবাহ শাস্ত্রসম্মত। ইংরাজগণ আইন করিয়া সহমরণপ্রথা নিবারণ ও বিধবা-বিবাহের বৈধতা প্রচার করিয়াছেন। জগৎপূজ্য মহাত্মা গান্ধী "হিন্দী নবজীবন" পত্রিকায় এক স্থলে লিখিয়াছেন "বৈধব্যের আতিশয্যকে ধর্ম্মানুমোদিত বলিয়া আমরা কি মহাপাপ করিতেছি না? যদি বৈধব্যকে সুরক্ষিত রাখা দরকার হয়, তবে পুরুষের কর্ত্তব্য কি, সে বিচার কি তাহাকে করিতে হইবে না? যাহার মন বিধবা হয় নাই, তাহার শরীর কি বিধবা থাকিতে পারে?"

জাগরণভীত ভারতবাসীর এখনও কুসংস্কারের অন্ধ-

কত টীকাকার প্রাচীন শাস্ত্রের ভ্রান্ত টীকা রচনা করিয়া দেশবাসীকে আরও ঘুম পাড়াইবার চেষ্টা করিয়াছে। তাহাদের টীকায় স্থানে স্থানে আলোক আসিবার যে সামান্য ফাঁক ছিল তাহা বন্ধ করিয়া, অন্ধবিশ্বাসী অনুবাদকের দল ভ্রান্ত অনুবাদ দেশমধ্যে প্রচার করিয়া, ভারতবাসীকে সেই মদিরায় এমন মোহিত করিবার যত্ন করিয়াছে যে আর যেন উত্থানের কোন সম্ভাবনা না থাকে। ভগবানের অপার করুণাবলে দুই একজন মহাপুরুষ কুসংস্কারকে পদদলিত করিয়া দেশবাসীর নিদ্রাভঙ্গের জন্য উচ্চ আহ্বান করিয়াছেন, কিন্তু সেই ঘোর নিশায় সকলে তাঁহাদের বাক্যে কর্ণপাত করে নাই। কেহ কেহ তাঁহাদের বাণী শুনিয়া জাগিল, কিন্তু রাত্রি অনেক আছে দেখিয়া তাহারা সকলকে জাগাইতে চেষ্টা করিল না। এখন পূর্ব্বদিক অরুণরাগে রঞ্জিত। সুষুপ্তি তন্দ্রায় পরিণত হইয়াছে। নিদ্রাভঙ্গের সম্ভাবনা। সেইজন্য মহাপুরুষগণের বাণী স্মরণ করিয়া দেশবাসীর সমীপে করজোড়ে নিবেদন করি—

ভাই সব উঠ, জাগ, চক্ষু উন্মীলন করিয়া দেখ—তোমার জন্মভূমি শ্মশানে পরিণত হইয়াছে। এমন গ্রাম নাই যেখানে ব্যভিচার হয় না, এমন পল্লী নাই যেখানে ভ্রূণহত্যা হয় না। সহরে প্রকাশ্য বেশ্যা মফঃস্বলে গুপ্ত বেশ্যা তোমাদেরই

করিতে না পারিয়া নির্ব্বংশ হইয়াছে। কত বিধবা লোক-লজ্জা সহ্য করিতে না পারিয়া জীবন বিসর্জ্জন করিয়াছে। তোমরা কত জন ছিলে ? এখন কত জন আছ ? তোমরা কি ছিলে ? এখন কি হইয়াছ ? একবার স্থিরচিত্তে ভাব তোমাদের অস্তিত্ব লোপ হইতে বসিয়াছে কিনা ? বিধবার আর্ত্তনাদে, বিধবার ব্যভিচারে, বিধবার অভিসম্পাতে তোমরা সবংশে মজিতেছ কিনা ? আর তিলার্দ্ধ বিলম্ব না করিয়া বিধবার অশ্রুমোচনে অগ্রসর হও। তোমাদের স্বার্থের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুঁটলী ও অভিমানের জঞ্জালরাশিকে দূরে নিক্ষেপ করিয়া, নারীজাতিকে তাহার ন্যায্য অধিকার প্রদানে অগ্রসর হও। পৈত্রিক কুসংস্কার ও পৈত্তামহিক অন্ধবিশ্বাস ত্যাগ কর। তোমরা সৎসাহসে ভর করিয়া ঋষিনির্দ্দিষ্ট পথের পথিক হইলেই ঋষিসঙ্ঘ তোমাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিবেন, দেবতা সকল তোমাদের সহায় হইবেন। তোমাদের দীনতা হীনতা কুটিলতা বিদূরিত হইবে। তোমরা জগৎপূজ্য জাতি বলিয়া জগতে আবার সম্মান লাভ করিবে।

পরিশিষ্ট

বিধবা-বিবাহ উপলক্ষে সাধারণতঃ নিম্নলিখিত তিনটী প্রশ্ন উত্থাপিত হইয়া থাকে, সেজন্য সংক্ষেপে সেই তিনটী প্রশ্নের উত্তর লিপিবদ্ধ হইল।

প্রশ্ন :—

(১) পিতা একবার কন্যাদান করিয়া যখন সত্ত্বচ্যুত হইয়াছেন, তখন সেই কন্যা বিধবা হইলে পিতা পুনরায় তাহাকে অন্য বরে দান করিবেন কিরূপে?

(২) কন্যা প্রথম-বিবাহ সময়ে গোত্রান্তরে গমন করে, সুতরাং দ্বিতীয় বিবাহে তাহার কি গোত্র উচ্চারিত হইবে?

(৩) বিধবা-বিবাহে কি মন্ত্র ব্যবহৃত হইবে এবং কি অনুষ্ঠান আচরিত হইবে?

উত্তর :—

(১) আমরা 'দান' শব্দ নানা অর্থে ব্যবহার করি। যেমন পুরোহিতকে গো-দান, ধোবাকে বস্ত্র-দান, আসামীকে দণ্ড-দান, অভ্যাগতকে আসন-দান, শিষ্যকে চপেট-দান, রাখালকে গো-দান ইত্যাদি ইত্যাদি স্থলে দাতা সর্ব্ব সত্ত্ব ত্যাগ করিয়া কেবল পুরোহিতকে গোদান বা তত্তুল্য দ্রব্যদান গ্রহীতাকে কোন বস্তু দান করে, তদ্ভিন্ন অপর সকল স্থলে দানার্থক দা ধাতুর যে প্রয়োগ তাহা গৌণ অর্থাৎ কথার

দান ? প্রথমতঃ দেখা যায় কন্যার উপর পিতার দুইটী সত্ত্ব আছে :—১মটী জনক-সত্ত্ব অর্থাৎ পিতা কন্যাকে জন্ম দিয়াছেন, সেই সম্বন্ধ চিরস্মরণীয় করণজন্য কন্যা জনককে পিতা বলিয়া ডাকিবে ; ২য়টী পালন-সত্ত্ব অর্থাৎ পিতা কন্যাকে পালন করিবেন। এই দুইটী সত্ত্ব ব্যতীত কন্যার উপর পিতার আর কোন সত্ত্ব নাই। কন্যার বিবাহসময়ে পিতা তাঁহার জনক-সত্ত্ব দান করেন না ; কারণ তাহা হইলে গ্রহীতাকে কন্যা পিতৃ সম্বোধন করিত (যেমন দত্তক পুত্র গ্রহীতাকে পিতৃ সম্বোধন করে,) এবং পিতা কন্যাকে কখন নিজগৃহে আনিতেন না (যেমন দাতা পুরোহিতের বাড়ী হইতে কখন গরু আনয়ন করেন না)। কন্যার বিবাহ সময়ে পিতা কেবলমাত্র পালন-সত্ত্ব জামাতাকে দান করেন। জনক পালন করিতেন বলিয়া যেমন কন্যা তাঁহাকে পিতা (পাধাতু) বলিত, স্বামী সেইরূপ পালন করেন বলিয়া স্ত্রী তাঁহাকে পতি (পাধাতু) বলে। সেই পালক (পতি) মৃত হইলে কন্যার পিতা দ্বিতীয় পালককে (পতিকে) কন্যাদান করিতে পারেন, যেমন এক রাখালের মৃত্যুতে গৃহস্থ অন্য রাখালকে গাভী পালনার্থ প্রদান করেন। সুতরাং বিবাহের কন্যাদান ব্যবহারিক দান, উহা বিবাহাঙ্গ কথার দান মাত্র। তাহা না হইলে পিতৃ-বর্ত্তমানে অন্য

সমন্বিত একটী মনুষ্য। সে কি ঘটি-বাটির ন্যায় একটা অস্থাবর দ্রব্য, যে দান-বিক্রয়ের বিষয়ীভূত হইবে?

(২) বিধবার পুনর্ব্বিবাহে পিতৃগোত্রই উচ্চারণ করিতে হইবে, কারণ গোত্র শব্দের অর্থ পূর্ব্বপুরুষ। যাহার বংশে যে জন্ম গ্রহণ করিয়াছে সেই তার গোত্র। কন্যা যে গোত্রে জন্ম গ্রহণ করিয়াছে তাহার জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত সেই গোত্র থাকিবে। প্রথম বিবাহে তাহার গোত্র পরিবর্ত্তন অসম্ভব, কারণ বিবাহে পিতৃ-পরিবর্ত্তন বা জন্ম-পরিবর্ত্তন হয় না। তবে যে শ্রাদ্ধাদিতে স্বামিগোত্র উচ্চারণ করার প্রথা দেখা যায়, তাহা সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত নহে। পতিলোকে স্বামী ও স্ত্রী একত্রে থাকেন, স্বামীর গোত্র উচ্চারণ করিলে পিণ্ড সহজে স্ত্রীর নিকট উপনীত হইবে, এই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া পুরোহিতগণ এই ব্যবস্থা করিয়াছেন। বস্তুতঃ স্ত্রী কখনও স্বামীর গোত্র প্রাপ্ত হয় না, চিরকাল তাহার পিতৃগোত্র অক্ষুণ্ণ থাকে।

(৩) সাধারণতঃ স্ত্রী বা পুরুষের প্রথম বিবাহে যে মন্ত্র পঠিত হয় এবং যে অনুষ্ঠান আচরিত হয়, বিধবা-বিবাহে তাহাই করিতে হইবে। এইমাত্র মনে রাখিলে যথেষ্ট হইবে যে বিপত্নীক পুরুষের দ্বিতীয় বিবাহে যে যে মন্ত্র উচ্চারিত এবং যে যে আচার রক্ষিত হয়, বিধবা নারীর পুনর্ব্বিবাহে তাহাই হইবে।

সম্পূর্ণ।

বিধবা-বিবাহ সমিতি

মেদিনীপুর।

বালবিধবাগণের হিন্দুশাস্ত্রমত বিবাহ প্রদান ও উক্ত মত সর্ব্বত্র প্রচার করিবার জন্য এই সমিতির প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। মেদিনীপুর জেলার বহু গণ্য মান্য সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ইহার পৃষ্ঠপোষকতা করিতেছেন। বিবাহার্থ বহু পাত্র পাত্রীর সংবাদ আমাদের নিকট মজুদ রহিয়াছে, আবশ্যক মত সন্ধান করুন। রিপ্লাই কার্ড অথবা টিকিট সহ পত্র লিখিলে যাবতীয় জ্ঞাতব্য সংবাদ ও পুস্তক পুস্তিকাদি প্রেরণ করা হয়। জেলায় চারিটী শাখা-সমিতি স্থাপিত হইয়াছে। আমরা আরও শাখা সমিতি প্রতিষ্ঠা করিতে চাই। যাঁহারা এই শুভানুষ্ঠানে যোগদান করিতে অভিলাষী তাঁহারা আমার নিকট পত্র লিখিলে বাধিত হইব। এই সমিতির চেষ্টায় এপর্য্যন্ত ৫৩টী বিধবার বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে। এই সমিতির সাহায্যার্থে কেহ কিছু দান করিলে সাদরে গৃহীত হয়।

মেদিনীপুর, শ্রীভাগবত চন্দ্র দাশ

১৩৩৩।২০শে অগ্রহায়ণ সম্পাদক